নষ্টনীড় থেকে চালতা লেখার মধ্যে লেখা রহিল

শুভেন্দু দাশমুন্সী

রবীন্দ্রনাথের কাহিনি অবলম্বনে সত্যজিৎ রায়ের তৈরি তিনটি ছবির পোস্টারে কাহিনিকার রবীন্দ্রনাথের নামে াল্লেখসত্যজিৎ তিনভাবে করেছেন। ১৯৬১-তে তৈরি 'তিনকন্যা'র পোস্টারে লেখা হয়েছিল ''রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্পের চিত্ররূপ'', ১৯৮৪ -তে তৈরি 'ঘরে-বাইরে'র পোস্টারে লেখা ছিল ''রবীন্দ্রনাথ রচিত উপন্যাস অবলম্বনে'' আর এর ম াঝখানে ১৯৬৪ সালে নির্মিত 'চালতা'র পোস্টারে সত্যজিৎ লিখলেন, ''রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়'।'' ব্যাস্ !এইটুকুই ! 'চ ালতা' ছবিটিকে বলা হল ''রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়''। ঠিক এইভাবে সত্যজিৎ নিজের ছবির পোস্টারে এর আগে আরো দু'বার কাহিনিকারের নামোল্লেখ করেছেন। একবার লিখেছিলেন ''বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী'' আর-একবার লিখেছিলেন ''তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধায়ের জলসাঘর''। যদি আমাদের মনে থাকে 'পথের পাঁচালী' ও 'জলসাঘর'-এর আখ্যানে দুই বিভিন্নভাবে মিশে আছে তাদের লেখকের আত্মজীবনীর ভগ্নাংশ, তাহলে ''বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায়ের পথের পাঁচালী'' বা ''তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জলসাঘর'' শুধু লেখকের ও তাঁর লেখার নামোল্লেখ মাত্র থাকে না ; এটি একটি পূর্ণবাক্য হিসেবে, হয়ে ওঠে, কাহিনি সম্পর্কে, পরিচালক সত্যজিতের মন্তব্যও। এই দিক থেকে 'নষ্টনীড়''--বল া নিতান্ত আকস্মিক মনে হয় না !

সত্যজিৎ রায়, অ্যান্ড্রু রবিনসনকে বলেছিলেন, "Tagore had known the pains, the tensions and the anguish that eat into a man's soul, the real nature of the emotional crisis one has to go through –all this Tagore knew very well" । সত্যজিতের এই মন্তব্যটি উল্লেখ করে রবিনসন লিখেছিলেন "He (সত্যজিৎ রায়) has seen a very early manuscript of Nastanirh with marginalia which refer many times to Hecate - Rabindranath's name of kadambari. There is even a profile portrait sketch- 'the sort that one would do when one is groping for ideas and not actually writing' –which is obviously of Kadambari. 'She was at the back of his mind-there's doubt of that,' Says Ray, 'And that I thought was significant' ।

এই অংশটি লিখতে গিয়ে আপাতদৃষ্টিতে সামান্য, কিন্তু তথ্যের বিচারে অ-সামান্য গোলমাল পাকিয়ে ফেলেছেন, রবিনসন। কারণ, সত্যজিৎ 'নষ্টনীড়'-এর পাণ্ডুলিপি বা তার খসড়া দেখবেন কোথায়, 'নষ্টনীড়'-এর কোনো পাণ্ডুলিপিই তো পাওয়া যায়নি। লক্ষণীয় 'নষ্টনীড়'-এর পাণ্ডুলিপির কথা রবিনসনের জবানিতে আছে, সত্যজিৎ রায়ের প্রত্যক্ষ উক্তিতে নেই। সত্যজিৎ সম্ভবত রবীন্দ্রনাথেরই প্রথমদিকের পাণ্ডুলিপির কথা বলেছিলেন 'নষ্টনীড়'-এর পাণ্ডুলিপির কথা নয়। 'চালতা' মুক্তি পাওয়ার পরের বছর বিশ্বভারতী থেকে বিজনবিহারী ভট্টাচার্যর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্র-জিজ্ঞ াসা বইটির প্রথম খণ্ড (১৯৬৫)। সেখানেই ছাপা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের এ যাবৎ পাওয়া আদি পাণ্ডুলিপি --- 'মালতী পুঁথি'। বস্তুত, এই পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠার মার্জিনে সত্যজিতের বলা, রবীন্দ্রনাথের স্বহস্ত- লিখিত 'হেকেটি' নাম আর 'even a profile portrait sketch' দেখা যায়। এই পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫-তে , তাহলে কি 'চালতা' ছবি তৈরির আগে রবীন্দ্রভবনে এই পাণ্ডুলিপি সত্যজিৎ দেখে এসেছিলেন?

দেখে এসেছিলেন কি না জানি না, তবে 'নষ্টনীড়' কাহিনীর জীবনীনির্ভর পাঠ প্রকল্পে নিঃসন্দেহে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, 'চালতা' মুক্তি পাওয়ার দু'বছর আগে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত, জগদীশ ভট্টাচার্যর লেখা রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ কবিজীবনী কবিমানসী। কবিমানসী-তে জগদীশবাবু লিখলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিশুজীবনের প্রাকৃত কাহিনীতে সাহিত্যে প্রতিভাসিত করেছেন, 'ডাকঘর'-এর অমল চরিত্রের মধ্যে। শিশু - অমল শিশু - রবিরই নাট্যসংকেত। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অমল চরিত্রকে প্রথমে পাই 'নষ্টনীড়'-এ। 'নষ্টনীড়'-এ অমলের কৈশোরলীলা। 'ডাকঘর'-এর শিশু অমলের মতোই 'নষ্টনীড়'-এর কিশোর অমলকে কবি নিজের আদলেই গড়েছেন বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

প্রাজ্ঞ সমালোচক একথা বলেও পাঠককে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন, "কথাশিল্পীর সৃষ্ট অংসখ্য চরিত্রের মধ্যে কোনো একটি বিশেষ চরিত্রকে শিল্পীর জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সময় সর্বদাই মনে রাখতে হবে যে, আসলের সঙ্গে তার সবটা লাইনে লাইনে মেলবার কথা নয়, কেননা তার অনেকখানি মনগড়া।"

রবীন্দ্র-চর্চায় কবিমানসী এখন কার্যত নৈঃশব্দ্যের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বিস্মৃত প্রায়, কিন্তু প্রকাশকালে এই বই-ই হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রচর্চার কেন্দ্রীয় বিষয়*। বস্তুত এই বইটি থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে রাখলেও, সেই বইয়ের প্রতিপাদ্য কিন্তু পরবর্তী রবীন্দ্রচর্চায় নানাভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং হচ্ছেও। এই বইতেই রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির অন্তরঙ্গ প্রেরণা হিসেবে, কবিমানসীকার নির্দিষ্ট করেছিলেন, আনা তরখড়-মৃণালিনী দেবী আর ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে ; আর কবিমানসীদের মধ্যে যাঁকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিজীবনের ধ্রুবতারা হিসেবে স্থির করেছেন, আছেন তিনি---রবীন্দ্রনাথের নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবী। শুধু কবির বহির্জীবনের নির্মাণে নয়, তাঁর কাব্যসৃষ্টিতেও এঁদের প্রেরণা বহুবিচিত্র পথে পরিব্যাপ্ত। সেই ব্যাপ্তির নিপুণ ও সংবেদনশীল বিশ্লেষণ কবিমানসী। রবীন্দ্রজীবনের পরিচিত তথ্যকে নবীন দৃষ্টিতে আলোকিত করে ও রবীন্দ্র-রচনাবলির উপেক্ষিত রচনারও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছিল, আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের সমান্তরালে কবি রবীন্দ্রনাথের বিরহী প্রেমিকসত্তা।

বিরহী রবীন্দ্রনাথেরে কবিজীবনী রচনা করলেন জগদীশ ভট্টাচার্য। সত্যজিৎ রবিনসনকে বলেছিলেন কবির গভীরতম বেদনা ও যন্ত্রণার কথা, অন্যদিকে, অনেকটাই আগে, ১৯০০ সালে স্বসম্পাদিত সোফিয়া পত্রিকায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, তাঁর বহু বিখ্যাত 'দ্য ওয়ার্ল্ড পোয়েট অব বেঙ্গল' প্রবন্ধে, লিখেছিলেন, রবীন্দ্র কবিতায় যে 'spirit of sadness' আর 'pain and anguish' দেখা যায়, তার উৎসে আছে 'an excruciating pain of an unrequited love' । অন্যদিকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কবিমানসী গ্রন্থ প্রকাশের আগে রবীন্দ্র - শতবর্ষে লিখলেন That in course of time he (রবীন্দ্রনাথ) and the wife of his brother Jyotirindranath fell desperately in love with each other did not mend matters at all; and when the family married him off presumably to prevent scandal, bad got worse and worse until his sister – in – law killed herself.

সত্যজিৎ কবিমানসী পড়েছিলেন কিনা জানা নেই, তবে সিনেমা তৈরির আগে তিনি যে ধরনের পড়াশোনা করতেন তাতে সমকালের অন্যতম প্রধান রবীন্দ্র বিষয়ক গ্রন্থটি তিনি দেখেননি এমন মনে হয় না। বিশেষত যে বইটি রবীন্দ্রনাথের জীবনীমূলক পাঠ পদ্ধতির অসামান্য নিদর্শন, সেটি সত্যজিতের পক্ষে দেখাই স্বাভাবিক। এর পাশাপাশি চালতার চিত্রনাট্য থেকেও অনুমান করা সম্ভব রবীন্দ্রনাথ-কাদম্বরী সম্পর্কটিকে সত্যজিৎ এই ছবিতে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন। সেই ব্যক্তিগত সম্পর্কের কিছু ইঙ্গিত তিনি গ্রহণ করেছেন সরাসরি 'নষ্টনীড়' কাহিনি থেকে আর কিছু তিনি মিশিয়েছেন অন্যান্য তথ্যসূত্র ও রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা - বই দুটির সাক্ষ্যে।

দুই

জগদীশ ভট্টাচার্য 'নষ্টনীড়' গল্পটিকে নিজের মত সাজিয়েছিলেন কবিমানসী-র 'নেপথ্যবিধান' অধ্যায়ের জন্য। 'নষ্টনীড়' কাহিনির কোনো কোনো অংশ তিনি বাদও দিয়েছিলেন। মূল কাহিনিটি শু হয় ভূপতিকে দিয়ে, শেষ হয় চালতাকে দিয়ে, পক্ষ

ান্তরে সিনেমা শেষ হয়, ভূপতিকে দিয়ে কিন্তু আরম্ভ হয় চালতাকে দিয়ে বা বিশেষ করে বলা ভালো চালতার একাকিত্ব দিয়ে। জগদীশবাবুওউদ্ধৃতির মধ্যে নিজের ভাষায় ভূপতির কাগজ প্রকাশের খবরটুকু দিয়ে--উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে রবীন্দ্রন াথের ভাষায়--কাহিনি আরম্ভ করেন চার একাকিত্ব দিয়েই। আর অমল চালতার সম্পর্কের নির্মাণ বৃত্তান্তে প্রথম গুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করল তাদের বাগান বিষয়ক পরিকল্পনা; মূল কাহিনীর মধ্যে অমলের জন্য কার্পেটের জুতো তৈরি-মশারিতে নকশা আঁকার পর্ব জগদীশবাবু বাদ দিয়েছিলেন। কবির চিত্রনাট্যেও কিন্তু অমল-চার সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমস্থান নিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা আর তারপরেই বাগান - পরিকল্পনা পর্বর শু। বাগান পরিকল্পনার মধ্য থেকেই আরম্ভ হয় অমলের সাহিত্যচর্চা। মূল কাহিনিতে এরপর বহু ছোটোবড়ো ঘটনার সমাহার আছে, জগদীশবাবু তার মধ্য থেকে শুধু উদ্ধৃত করেছিলেন একটি পঙ্‌ক্তি ''এখন অমলের লেখাই তাহাদের আলোচনা ও পরামর্শের প্রধান বিষয় হইয়া উঠিল।'' চিত্রনাট্যেও লক্ষণীয় এই সূত্রটিই বস্তুগত রূপলাভ করেছে এবং এখানে মূল কাহিনির অমলকে কেন্দ্র করে চা মন্দার প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্বটি বাদ দিয়েছেন জগদীশবাবু আর সত্যজিৎও। জগদীশবাবু সেই প্রসঙ্গ বাদ রেখেছেন রবীন্দ্রজীবনে এ যাবৎ পাওয়া তথ্যে ওই ধরনের কোনো দ্বন্দ্ব, জীবনের এইপর্যায়টিতে নেই বলে ; সত্যজিৎও হয়ত সেই কারণেই পর্বটি ব াদ রেখেছেন। তবে চিত্রনাট্যকে সংহত করবার দাবিও নিশ্চয়ই আছে।

কাহিনিতে চার রচনারম্ভের কারণ আর চিত্রনাট্যের চার রচনারম্ভের কারণেও ঘটে গেছে তফাত। মূল কাহিনিতে চা লিখতে আরম্ভ করে মন্দাকিনীর তুলনায় বস্তুত অমল আর চার মধ্যে সীমাবদ্ধ পত্রিকাটির জন্যই চার রচনারম্ভের সূত্রপাত, আর ত ার সেই লেখাটিকে অমল-ই পাঠিয়ে দেয় পত্রিকার দপ্তরে। কিন্তু ছবিতে দেখা যায় অমলের প্রথম লেখাটি প্রকাশের আগে সেই প্রকাশ বিষয়ক যাবতীয় পরিকল্পনা সে করে মন্দার কথামতই অমল লেখা পাঠায় 'সরোহ' পত্রিকার দপ্তরে। চা যেন এরই মধ্যে, এরই প্রতিত্রিয়ায়, তার লেখা তৈরি করে পাঠিয়ে দেয় 'ঋিবন্ধু' পত্রিকায়। জগদীশবাবু তাঁর ভাষ্যের 'নষ্টনীড়' কাহিনি শেষ করেন অমলের আর তার বউঠানের মাঝখানে বাংলাদেশের পাঠকমণ্ডলীর এসে দাঁড়াবার সংবাদে।

জগদীশবাবু 'নষ্টনীড়' কাহিনিকে সেখানেই থামিয়ে দিয়েছিলেন, যেখানে পৌঁছে রবীন্দ্রজীবনে কবিখ্যাতির আরম্ভ। কিন্তু সে তো কাহিনির গতি - পরম্পরায় 'নষ্টনীড়' কাহিনির বিন্যাস। যদি আমরা কাহিনিসূত্র বাদ দিয়ে খুঁজে দেখি রচনা- মধ্যস্থ বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ, তাহলে দেখব রবীন্দ্র-কাদম্বরী সম্পর্কের বহুবিধ ইঙ্গিতে বিন্যস্ত হয়েছে 'নষ্টনীড়'-এর কাহিনি।

রবীন্দ্রনাথ চালতার কাহিনি বলতে শু করেছিলেন তাঁর একাকিত্বর বর্ণনা দিয়ে। কিন্তু তারপরেই জানিয়ে দেন ''লেখাপড় ার দিকে চালতার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল বলিয়া তাহার দিনগুলা অত্যন্ত বোঝা হইয়া উঠে নাই। সে নিজের চেষ্টায় নানা কৌশলে পড়িবার বন্দ্যোবস্ত করিয়া লইয়াছিল।'' পড়াশুনার প্রতি আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে অমলের দাবি মেটাতে সে ''লুকাইয়া বহু যত্নে কার্পেটের সেলাই শিখিতে লাগিল।'' শুধু শিখলই না, অমলকে একদিন রীতিমত নিমন্ত্রণ করে ''গ্রীষ্মের সময় ছাদের উপর আসন করিয়া'' অমলের খাবারের ব্যবস্থা করে, খাবার ঢাকা দেওয়ার মত ঢেকে, তাকে ওই কার্পেট বুন্‌নি জুতোজোড়া উপহার দিল। চালতা সম্পর্কে প্রথম দেওয়া তিনটি ইঙ্গিতই বউঠানের স্মৃতিতে ভরে আছে। প্রথমত, জীবনস্মৃতি-তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ''সাহিত্যে বউঠাকুরানির প্রবল অনুরাগ ছিল, বাংলাই তিনি যে পড়িতেন, কেবল সময় কাটাইবার জন্য তাহা নহে--তাহা যথার্থই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিতেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আ মি অংশী ছিলাম।'' বউঠানের সাহিত্যপ্রীতির সঙ্গে তাঁর সূচিশিল্পে নৈপুণ্যের প্রসঙ্গও জীবনস্মৃতি-তেই উল্লিখিত, কবি বিহ ারীলাল চত্রবর্তীকে বউঠান ''নিজে হাতে রচনা করিয়া... একখানি আসন দিয়াছিলেন।'' এই সংবাদ শুধু রবীন্দ্রনাথের স াক্ষ্যেই নয়, ধরা আছে বিহারীলাল চত্রবর্তীর সাধের আসন (১৯০০) কাব্যগ্রন্থের নবম সর্গের নাম 'আসনদাত্রী দেবী'--- এই অংশটিকে যে কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত সে কথা আজ কবিমানসী-র প্রকাশের পরে, আর প্রমাণের অপেক্ষা র াখে না। এই সর্গটি আমাদের পরে আবার কাজে লাগবে। তৃতীয়ত, দেবর, রবীন্দ্রনাথকে বউঠানের রীতিমত নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবার উল্লেখ জীবনস্মৃতি-তে না থাকলেও, রয়েছে ছেলেবেলা-য় নবম পরিচ্ছেদ লিখতে বসে বউঠানের ওই নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবার সংবাদের পরেই কিন্তু ভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয় চটিজুতো - জোড়ারই প্রসঙ্গ। মানবমনের কোন্ কারখান

াঘরে স্মৃতি এমন বিচিত্ররূপলাভ করে তার অনুসন্ধান মনস্তত্ত্ববিদের কাজ, আমাদের কাছে অসম্ভব ইঙ্গিতপূর্ণ এই সহাবস্থ ান। প্রাসঙ্গিক অংশটুকু এখানে উদ্ধারযোগ্য

বউঠানের জায়গা হল বাড়ি ভিতরের ছাদের লাগাও ঘরে। সেই ছাদে তাঁরই হল পুরো দখল। পুতুলের বিয়েতে ভোজের পাতা পড়ত সেইখানে। নেমন্তন্নের দিন প্রধানব্যক্তি হয়ে উঠত এই ছেলেমানুষ। বউঠাকন রাঁধতে পারতেন ভালো, খাওয় াতে ভালোবাসতেন ; এই খাওয়াবার শখ মেটাতে আমাকে হাজির পেতেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এলেই তৈরি থাকত তাঁর আপন হাতের প্রসাদ। চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পান্তাভাত যেদিন মেখে দিতেন অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে, সেদিন আর কথা ছিল না। মাঝে মাঝে যখন আত্মীয়-বাড়িতে যেতেন, ঘরের সামনে তাঁর চটিজুতো-জোড়া দেখতে পেতুম না, তখন রাগ করে ঘরের একটা কোনো দামি জিনিস লুকিয়ে রেখে ঝগড়ার পত্তন করতুম।

চা-অমল সম্পর্কের এই প্রথম পর্যায়ের পরবর্তী অংশে আসে তাদের বাগান পরিকল্পনার পর্ব। বাগানটি সম্পর্কে প্রথমেই যে তথ্য রবীন্দ্রনাথ দেন তা এরকম

ভূপতির অন্তঃপুরে যে একখণ্ড জমি পড়িয়াছিল তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা অত্যুক্তি করা হয়। সেই বাগানের প্রধান বনস্পতি ছিল একটা বিলাতি আমড়া গাছ।

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি-র প্রথম পাণ্ডুলিপিতে লিখেছিলেন তাঁদের 'বাড়ি-ভিতরের অনাদৃত' বাগানটির কথা আর সেই বাগ ানের অন্যান্য গাছের সঙ্গে প্রথম যে গাছটির উল্লেখ তিনি করেন সেটি 'একটি বড় বিলাতি আমড়া' গাছ। ঠাকুরবাড়ির এই 'বাড়িভিতরের বাগান'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চন্দননগরের মোরান গার্ডেনের স্মৃতি। রবীন্দ্রজীবনকথার সঙ্গে পরিচিতজনই জানেন রবীন্দ্রমানস বিকাশে তাঁর এই চন্দননগর বাস পর্বের অপরিসীম গুত্বের কথা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মোরান গার্ডেন গেলেন ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের বর্ষায়। জীবনস্মৃতি-র 'প্রভাতসংগীত'-অধ্য ায়ে তিনি লিখেছিলেন "গঙ্গার ধারে বসিয়া সন্ধ্যাসংগীত ছাড়া কিছু কিছু গদ্যও লিখিতাম।.. এই ছোটো ছোটো গদ্য লেখাগুলো এক সময়ে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' নামে গ্রন্থ আকারে বাহির হইয়াছে।" এই বিবিধ প্রসঙ্গ-র প্রবন্ধগুলির জন্মমুহূর্তের ইতিবৃত্তটি লেখা আছে ওই বইয়ের শেষ রচনা 'সমাপন'-- এ। বস্তুত, 'সমাপন'-ই বিবিধ প্রসঙ্গ-র উৎসর্গপত্রও বটে। বউঠানের নাম উল্লেখ না-করে - লেখা এই উৎসর্গপত্রে গোটা বইটিকেই নিজের 'হৃদয়ের ইতিহাস' বলে চিহ্নিত করে শেষ অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন

আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি। ---এ ভাবগুলির সা হিত্য তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে ! সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে ? সেই স্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যে াৎস্নালোক ? সেই দুইজনে স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা ? সেই প্রভাতেরবাতাস, সন্ধ্যার ছায়া ! একদিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে ! কিন্তু আমার এই ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল। এই লেখাগুলির মধ্যে কিছু দিনের গোটাকতক সুখ দুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক - একদিন খুলিয় া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না ! আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল---এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।

উদ্ধৃতি ঈষৎ দীর্ঘ হলেও, বউঠান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই স্পষ্ট ও দীর্ঘ উচ্চারণ তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের মাধুর্যও ঐর্য দুই-ই চমৎকারভাবে প্রকাশ করে। তাঁদের চন্দননগর বাসপর্বের 'মৃদু গম্ভীর স্বরে' করা সেইসব 'গভীর আলোচন া'গুলি হয়ে উঠেছে বিবিধ প্রসঙ্গ-র বিষয়সূত্র সেই আলোচনার স্থানানুষঙ্গ তৈরি করেছে 'নষ্টনীড়' -এর বাগান পরিকল্পনা পর্বের পটভূমি।

বাগান পরিকল্পনা পর্বের আরো কয়েকটি ব্যক্তিগত অনুষঙ্গ সন্ধানের আগে 'নষ্টনীড়'-এ উল্লিখিত ও 'চালতা'-য় গৃহীত দুটি বিষয় এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করে নেওয়া দরকার। প্রথমত, চার ঘরের লাগোয়া ছাদে তার বানানো বাগানের প্রসঙ্গ ও দ্বিতীয়ত, চার পাখি পোষা শখের কথা। প্রথম প্রসঙ্গটি কাহিনিতেও আছে, চিত্রনাট্যেও আছে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি কাহিনিতে নেই, যুক্ত হয়েছে চিত্রনাট্যে। বউঠানের নিজের হাতে তার ঘরের লাগোয়া ছাদকে বাগান বানিয়ে তে ালার আর তাঁর পাখি পোষার শখের খবর পাওয়া যাবে ছেলেবেলা-র দশম ও একাদশ পরিচ্ছেদে। কাদম্বরীর তৈরি প্র

াগুপ্ত সাধের আসন কাব্যগ্রন্থের 'আসনদাত্রী দেবী' শীর্ষক সর্গে। এই সর্গের ছয় সংখ্যক স্তবকে বিহারীলাল লিখেছিলেন

সেই ছাদে তরাজি, শূন্য শোভে উপবন,
সেই জাল ঘেরা পাখি, সেই খুদে হরিণী,
সেই প্রাণ খোলা গান, সেই মধু যামিনী,
কী যেন কী হয়ে গেছে !
কী যেন কী হারায়েছে !
কেন গো সেথায় যেতে কিছুতে সরে না মন ?

'সেই ছাদে তরাজি' বা 'সেই জালঘেরা পাখি' আর 'সেই প্রাণখোলা গান'--প্রসঙ্গ জীবনস্মৃতি ও ছেলেবেলা-র পাঠকের কাছে অত্যন্ত পরিচিত--এর প্রতিটিই রবীন্দ্রস্মৃতিতে কোনো- না- কোনো ভাবে কাদম্বরী দেবী সম্পর্কে উল্লিখিত। শুধু কাদম্বরী দেবীর সম্ভবত কোনো স্বপ্ন - আকাঙক্ষায় যে 'খুদে হরিণী'ও ছিল, তার চিহ্টুকু থেকে গেছে বিহারীলালের কাব্যে ও রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' কাহিনিতে চার বাগান- পরিকল্পনার পর্বে। কাহিনিতে বাগান বানাবার সময়ে চার প্রস্তাব ছিল ''ঐ পশ্চিমের কোণটিতে একটা কুঁড়ে তৈরি করে নিতে হবে। হরিণের বাচছা থাকবে।''

কাদম্বরী - রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কের মাঝখানে আলোচ্য ব্যক্তি হিসেবে বারবার উল্লিখিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর বিহারীলাল চক্রবর্তীর নাম। কাহিনিতেও সমকালীন জনৈক লেখকের একটি নাম ব্যবহৃত হয়--মন্মথ দত্ত। বলা বাহুল্য এই নাম কাল্পনিক। রবীন্দ্রনাথের কাছে বউঠান কীভাবে বিহারীলালের কথা বলতেন তার একটি নমুনা আছে ছেলেবেলা-য়। ছেলেবেলা-য় রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, ''বউঠাকুরণের ব্যবহার ছিল উল্টো । কোনোকালে আমি যে লিখিয়ে হব, এ তিনি কিছুতেই মানতেন না। কেবলই খোঁটা দিয়ে বলতেন কোনোকালে বিহারী চক্রবর্তীর মতো লিখতে পারব না।'' নতুন বউঠানের এই তুলনা যে নিতান্তই স্নেহ-তিরস্কার সে কথাও নিশ্চয় বলার অপেক্ষা রাখেনা। 'নষ্টনীড়'-এ লক্ষনীয় অমলের মনে চা ''ঈর্ষা জন্মাইবার জন্য মন্মথর লেখার প্রচুর প্রশংসা'' করত। অবশ্যই বিহারীলাল যে অর্থে রবীন্দ্রনাথের কবিগু ও কাদম্বরী দেবীর অন্যতম প্রিয় কবি, সেইদিক থেকে কাল্পনিক মন্মথ দত্ত চা-অমলের কাছে ততখানি গুত্ববহ নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিশেষ এক সাহিত্যিকের প্রশংসা করে কবিষশোপ্রার্থী স্নেহভাজনের মনে ঈর্ষা জন্মাবার প্রয়াস দুই ক্ষেত্রেই উল্লিখিত।

কাহিনির প্রথম পর্যায়ে ছিল চার হাতে বোনা কার্পেটের জুতো - নকশা - করা মশারির কথা ; দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিলচা ও অমলের বাগান তৈরির পরিকল্পনা আর তৃতীয় পর্যায়ে অমলের লেখালেখির শু। প্রথম দুটি পর্যায়ের মতো তৃতীয় পর্যায়টিকেও রবীন্দ্রনাথের জীবনতথ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তবে সেক্ষেত্রে শুধু কৃতী লেখকরূপ অমলের আত্মপ্রকাশ আর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠাকে মেলালেই চলবে না। দেখা যাবে অমলেরগদ্যবিষয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথমজীবনের গদ্যবিষয়ের আশ্চর্য মিল। কখনো তার প্রকাশের ভাষাতেও সাদৃশ্য লক্ষণীয়। অমলের গদ্যস্তবকগুলির নামকরণেরস একটি সাধারণ ধরণ দুটি পদের 'র' বা 'এর' বিভক্তি বসিয়ে তাদের সংযুক্ত করা। যেমন, 'আষাঢ়ের চাঁদ' বা 'আমার খাতা' বা 'অমাবস্যার আলো'। রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের প্রবন্ধগুলিরও নামকরণের একটি সামান্য লক্ষণ ছিল পূর্বপদ ও উত্তরপদের মধ্যে র / এর বিভক্তি স্থাপন। যেমন, 'মনের বাগানবাড়ি', 'বধিরতার সুখ', 'আত্মীয়ের বেড়া', 'ইচছার দাম্ভিকতা', 'জগতের জমিদারি' ইত্যাদি। গল্পমধ্যে চার কথায় আমরা জানতে পাই অমলের লেখা পড়ে জনৈক নামজাদা নবগোপালবাবু তাকে বাংলার রাঙ্কিন নাম দিয়েছেন। জীবনস্মৃতি-র পাঠকমাত্রেরই মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের প্রবন্ধের অন্যতম সমালোচক ছিলেন ''ন্যাশনাল পেপার পত্রের এডিটার শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র।''

তিন

'নষ্টনীড়' ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। কিন্তু, সত্যজিৎ এই ছবির চিত্রনাট্যে এর ঘটনাকাল হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন ১৮৭৯ সাল। ৭ এপ্রিল ১৮৭৯ তারিখে অমল ভূপতির বাড়ি আসে, ভূপতির দপ্তরে যখন ঢোকেঅমল, তখন

টেবিলের ওপর রাখা একটা ক্যালেন্ডারে তারিখটি দেখা যায়। আর ভূপতির খবরের কাগজের ছাপাখানায় অমলকে ভূপতি তার প্রস্তূয়মান যে কাগজটির প্রথম পাতা দেখায়, সেটির প্রকাশের তারিখ ভূপতির সংলাপঅনুয়ায়ী 'এপ্রিল দ্য ন াইন্থ এইট্টিন সেভেন্টি নাইন'---৯ এপ্রিল ১৮৭৯। কাগজের শিরোনাম 'দ্য সেন্টিনেল', নীচেলেখা 'পাবলিশ্‌ড্ এভরি স্য াটারডে'। সাপ্তাহিক সেন্টিনেল শনিবার প্রকাশিত হয় বললেও, ক্যালেন্ডারের হিসেবে ৭বা ৯ এপ্রিল ১৮৭৯ -- শনিবার ছিল না, ছিল সোম বা বুধবার। সংগত কারণেই ভূপতি সরকারের চাপানো একের পর এক ট্যাক্স নিয়ে সম্পাদকীয় লেখে। কারণ লর্ড লিটনের সময়ের সবচেয়ে বড়ো সমস্যাই ছিল নিত্যনতুন ট্যাক্সের স্থাপন। লিটন গভর্নর জেনারল হয়ে আসেন ১৮৭৬ সালে, ওই পদে তিনি ছিলেন ১৮৮০ পর্যন্ত। তাঁর সময়েইআফগানিস্থান সীমান্ত নিয়ে ইংরেজরা আফগ ানদের বিদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আরম্ভ হয় দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ।ভূপতির সংলাপে আমরা শুনি, "সরকার আফগা নিস্থানে যুদ্ধ চালাচ্ছেন কেন জানো ? টু মেনটেন দ্য প্রেস্টিজ অফ ইংল্যান্ডইন ইউরোপ !" ---শেষ অংশটিও তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, দ্বিতীয় -ইঙ্গ আফগান যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল রাশিয়ার সঙ্গে আফগানিস্থানের সুসম্পর্কের বিস্তার। ফলে অ াফগান সম্রাট শের আলির দরবারে লিটন ইংরাজ দূত রাখবার প্রস্তাব করলে শের আলি স্পষ্টত জানিয়ে দেন, শ দূত না থাকা পর্যন্ত তিনি ইংরেজের দূতকে দরবারে আসতে দেবেন না। এই প্রত্যাখ্যানে শ - সূত্রে ইউরোপে ইংল্যান্ডের সম্মান রক্ষার প্রা ওঠে আর এই প্রত্যাখ্যানে ১৮৭৮-এ যুদ্ধ ঘোষণা।

ভূপতির সংলাপেই শুনি "মুদ্রণ আইনটি কি সমর্থন করবার জিনিস? তিন বছর হল তার কোনো প্রতিকার হচ্ছে না কেন?" লিটনের সময়ে ১৮৭৬ সালে পাকা হয় মুদ্রণ আইন বা প্রেস অ্যাক্ট। সমকালীনতাকে ঝিস্ত করে তোলবার জন সত্যজিৎ যে সকল রাজনৈতিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করেন, সেগুলি যথাযথ হলেও গোলমাল ঘটে সাহিত্যিক অনুষঙ্গের ক্ষেত্রে। কারণ, অমল তার প্রথম প্রবেশেই চাকে জিজ্ঞাসা করে, "আনন্দমঠ পড়ছ?" আমাদের অদ্ভুত লাগে এই কাল ানৌচিত্য। বঙ্গদর্শন-এ আনন্দমঠ তো প্রকাশিত হতে চৈত্র ১২৮৭ (অর্থাৎ ১৮৮১-র মার্চ - এপ্রিল) থেকে জ্যৈষ্ঠ ১২৮৯ (মে-জু ১৮৮২) পর্যন্ত। ১৮৭৯ র পটভূমিতে ১৮৮১ তে প্রকাশিতব্য উপন্যাসের উল্লেখ কালত্রমভঙ্গ দোষ তো বটেই।

এই অসঙ্গতির খুঁটিনাটি বাদ দিলে উনিশ শতকের শেষ দিকের একটি চমৎকার বাস্তবতা 'চালতা' ছবিতে ধরা আছে। মনে রাখতে হবে, সত্যজিৎ এই ছবির পটভূমিতে হিসেব ১৮৭৯-কে নির্দিষ্ট করেছিলেন অকারণে নয়। প্রথমত, মূলকাহিনিতেও সরকারের সীমান্তনীতি বিষয়ক বিবাদ বিসংবাদের খবর হয়েছে। ভূপতি সম্পর্কে কাহিনিকার জানালেন, "ভারত গবর্মেন্টের সীমান্তনীতি ক্রমশই স্ফীত হইয়া সংযমের বন্ধন বিদীর্ণ করিবার দিকে যাইতেছে, ইহাই তাহার প্রধান লক্ষ্যের বিষয় ছিল।" সত্যজিৎ সম্ভবত এই সীমান্তনীতির সূত্রটিকেই নির্দিষ্ট করেছেন ভারত-আফগান সীমান্ত সমস্যায় এবং সেইমত কাহিনির পটভূমি হিসাবে স্থির করেছেন ১৮৭৯। আবার দ্বিতীয়ত, এটাও লক্ষণীয় যে ১৯০১ সালে লেখা কা হিনির পটভূমি সত্যজিৎ পিছিয়ে দিয়েছেন ১৮৮৪-পর্ববর্তী সময়ে। ১৮৮৪ -তে বউঠানের আত্মবিসর্জন, ফলে ঘটনাকাল তৎপূর্ববর্তী হওয়াই তো সমীচীন।

কাহিনির মধ্যে ঘটনাকাল যেমন অনুল্লিখিত তেমনই অনুল্লিখিত প্রধান তিনটি চরিত্রের বয়ঃক্রম। ছবির মধ্যে অমল এসেই চ াকে প্রণাম করে, বোঝা যায় শুধু সম্পর্কের বিচারে নয়, বয়সের দিক থেকেও চা অমলের চেয়ে বড়ো। ব্যক্তিজীবনেও রবীন্দ্রনাথের চেয়ে দু'বছরের বড়ো ছিলেন কাদম্বরী দেবী। কিন্তু সবচেয়ে কৌতূহলপ্রদ সত্যজিৎ-নির্দিষ্ট অমল-ভূপতির বয়স। ছবির দর্শকদের এখানে ভূপতি - অমলের মধ্যকার একটি সংলাপ মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে
ভূপতি অমলকে বলে বাঙালি জাতিটাকে "শক্ত হবে হবে ফিজিক্যালি ! শুধু ব্রেন আর বুদ্ধি দিয়ে কিস্যু হবে না।"
অমল। আলবাত হবে।
অমল উঠে দাঁড়িয়েছে, হাত ভাঁজ করে বাইসেপ দেখায়।
ভূপতি হাত দিয়ে পরখ করে দেখে।
ভূপতি। মুগুর ভাঁজো?

অমল। দেখো, ফিল করো---
ভূপতি। বয়স কত হল ?
অমল। টোয়েন্টি থ্রি !
ভূপতি। আর আমার পঁয়ত্রিশ।
এরপর তাদের পাঞ্জা লড়ার দৃশ্য।

রবীন্দ্রজীবন সম্পর্কে অবহিত যে - কোনো মানুষই অমলের এই বয়সটি শুনে চমকে উঠবেন। রবীন্দ্ররচনায় বারবার ফিরে এসেছে তাঁর তেইশ বছর বয়সে পাওয়া মৃত্যুশোকের কথা। ওই বয়সটিতেই রবীন্দ্রনাথ হারিয়েছিলেন নতুন বউঠানকে। এর সঙ্গে আরো আশ্চর্যের বিষয়, নতুন বউঠানের মৃত্যুবৎসরে নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথেরও বয়স--ভূপতির মতোই -- পঁয়ত্রিশ।

'চালতা' ছবিতে সত্যজিৎ ব্যবহার করেছিলেন একটি দোলনা। চা-অমলের বাগান-পরিকল্পনা পর্বের পটভূমি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যে মোরান গার্ডেনের স্মৃতিকে ব্যবহার করেছিলেন, সত্যজিৎ কি সচেতন ছিলেন সেই সম্পর্কে ? কারণ রবীন্দ্রন াথ বর্ণিত মোরান সাহেবের বাগানের দৃশ্যে গুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল ওই বাগানবাড়ির জানালার শার্সিতে আঁকা একটি দে ালনার ছবি। জীবনস্মৃতি-তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ''ঘাটের উপরেই বৈঠকখানা ঘরের সার্শিগুলিতে রঙিন ছবিওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল, নিবিড় পল্লববেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা, সেইদোলায় রৌদ্র ছায়াখচিত নিভৃত নিকুঞ্জে দুজনে দুলিতেছে।'' প্রসঙ্গত, জগদীশবাবুও কবিমানসীর-র 'জীবনভাষ্য' খণ্ডের 'মোরান সাহেবের বাগানবা ড়ি' অধ্যায়ারম্ভে গুত্বের সঙ্গে মোরান গার্ডেনের এই দোলনার ছবিটির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ঠাকুরবা ড়ির অনুষঙ্গ 'চালতা' ছবিতে আরেকজায়গায় রেখেছেন চিত্রনাট্যকার। শোনা যায়, চার বাড়ির চাকরটির নামও আশ্চ র্যজনকভাবে মিলে যায় ঠাকুরবাড়ির 'চাকরদের বড়োকর্তা'র নামেরসঙ্গে। তার নাম ছিল, ছেলেবেলা-র সাক্ষ্যে, ব্রজ্জের আর চা প্রথমেই তাকে ডাক দেয় ''ব্রজ --ব্রজ'' বলে।

চ ালতা রবীন্দ্রনাথের বউঠান কাদম্বরীর সঙ্গে অনেকটা মেলানো। রবীন্দ্রনাথও তাঁর কাদম্বরী বউঠানের মডেলটা অনেকটাই ব্যবহার করেছিলেন 'নষ্টনীড়' গল্পে।'' তিনি অবশ্যই এই বক্তব্যের সমর্থনে সামগ্রিকভাবে জাহাজি ব্যবসা, পত্রিকা সম্পাদনা আর নাটক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে সংবাদপত্র সম্পাদক ভূপতির মিলেরকথা বলছেন আর স্বামীর ব্যস্ততার মধ্যে লক্ষ করেছেন অন্দরমহলে নি ঃসঙ্গ ও নিঃসন্তান কাদম্বরী দেবী চালতার সাদৃশ্য।

চার নিঃসঙ্গতা ও পরে অমলের সান্নিধ্যের সূত্রে বিষয়গত ভাবে সত্যজিৎ মিলিয়েছেন কাদম্বরী দেবীর একাকিত্ব এবং দেওর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রীতিস্নিগ্ধ সম্পর্কের প্রসঙ্গটি। সেই প্রসঙ্গটিকে মাঝখানে রেখেই 'চালতা' ছবির অনুপুঙ্খ তৈরির প্রয়োজনে চিত্রনাট্যকার ব্যবহার করেছেন ঠাকুরবাড়ির বিবিধ প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ। এই সংমিশ্রণ আসলে সত্যজিতের একটি পাঠ। অবশ্য সেটিই একমাত্র পাঠ নয়, তবে অন্যতম পাঠ। সেইজন্যেই কি 'চালতা' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর প্রথমেই মনে হয়েছিল "Tagore had know the pains, the tensions and the anguish that eat into a man's soul, the real nature of the emotional crisis are has to go through"? সেইজন্যই কি, গল্পের সীমানায় 'নষ্টনীড়' শব্দের তাৎপর্য ভূপতি ও চাকেন্দ্রিক হলেও, পোস্টারে সত্যজিৎ লিখেছিলেন ''রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়'' ?

শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুটি ছোটো কথা মনে রাখতেই হবে। প্রথমত, বউঠানের মৃত্যুশোকে কবি ভেঙে পড়েননি, বরং মৃত্যুশে াকই তাঁকে গড়ে তুলবে। আর দ্বিতীয়ত, 'নষ্টনীড়' ও 'চালতা' পাঠ্যদুটিকে বোঝবার জন্য এই ব্যক্তিগত জীবনীভিত্তি - মূলক পাঠই একমাত্র পাঠ নয়, আরো অনেকদিক থেকেই পড়া যেতে পারে এই দুই সৃষ্টি---তবে বহির্মহলের যেকোনো প াঠের সূচনাতেই এই অন্দরমহলের বিষয়টি মনে রাখা দরকার ; কারণ, এখানেই 'নষ্টনীড়' -এর স্রষ্টার সঙ্গে পাঠকের সহ

দয়ত্ব ঘটবে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com